CHANDRAKONA VIDYASAGAR MAHAVIDYALAYA

DEPARTMENTAL RESEARCH PROJECT

ON

Reading Folk Rituals and Local Beliefs: An Exploration of Religious Aspects of Chandrakona

Submitted by

Department of Bengali

Chandrakona Vidyasagar Mahavidyalaya

FUNDED BY

CHANDRAKONA VIDYASAGAR MAHAVIDYALAYA, CHANDRAKONA, PASCHIM MEDINIPORE

CHANDRAKONA VIDYASAGAR MAHAVIDYALAYA
Dist.- Paschim Medinipur
ESTD 1985

ACKNOWLEDGEMENT

We express our sincere gratitude to the individuals and organizations who/that offered their assistance through cooperation, contributing significantly to the successful completion of this project. First and foremost, we extend our deep sense of appreciation to the college authorities for their unwavering encouragement and support. Special recognition is reserved for the Temple Priests of various ancient temples near Chandrakona, whose cooperation and genuine efforts provided valuable information. Our heartfelt thanks also extend to all the faculty members in our department and across other departments of our college, whose generous assistance played a crucial role in the project's progress and completion. We commend the collaborative spirit of our cherished students who worked alongside us, generously sharing their knowledge and skills. Lastly, we acknowledge the active support of the non-teaching staff of our college during the survey works.

Chandrakona Town
Paschim Medinipur

Dr. Debdas Gayen
H.o.D.
Department of Bengali
Chandrakona Vidyasagar Mahavidyalaya

H.O.D. / Assistant Professor
Dept. of Bengali
Chandrakona Vidyasagar Mahavidyalaya

Principal,
Chandrakona Vidyasagar Mahavidyalaya
Chandrakona, Paschim Medinipur

Rathin Kumar Pal 10/09/2022
Dr. Rathin Kumar Pal
Assistant Professor
Department of Bengali
Chandrakona Vidyasagar Mahavidyalaya

Mamoni Mahata
Dr. Mamoni Mahata
Assistant Professor
Department of Bengali
Chandrakona Vidyasagar Mahavidyalaya

Pinaki Chakraborty 10/09/2022
Pinaki Chakraborty
SACT-II
Department of Bengali
Chandrakona Vidyasagar Mahavidyalaya

সূচীপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম	রামানুজ শ্রীসম্প্রদায়ের বড় অস্থল	৩-৯
দ্বিতীয়	রামানন্দী শ্রীসম্প্রদায়ের ছোট অস্থল	১০-১৬

ভারতবাসীর মর্মমূলে রয়েছে ধর্ম। ভারতে এই ধর্মসাধনার একটি সুপ্রাচীন ঐতিহ্য রয়েছে। পৌরাণিক ধর্মচর্চার সাথে সাথে লৌকিক ধর্ম পালনের বিষয়টিও অনেকক্ষেত্রে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছে। আর্য ও অনার্যদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ভাবনার আদান-প্রদান ও ধর্মচিন্তার পারস্পরিক লেনদেনের মাধ্যমে এই পৌরাণিক ধর্ম ও লোকধর্মের ভেতরকার ব্যবধান খানিকটা কমে আসে। ধর্মচর্চা ও ধর্ম সাধনার অঙ্গ হিসেবে প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে মন্দির-দেউল গড়ে উঠতে শুরু করে। আমাদের বঙ্গদেশেও বিভিন্ন ধর্ম ও জাতিগোষ্ঠীর বসবাস থাকায় এই প্রদেশেও ধর্মচিন্তার বৈচিত্র্য ধরা পড়ে। এখানে অস্ট্রিক গোষ্ঠীর মানুষের বাস রয়েছে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে।ফলে তাদের লোকাচার, ধর্মসংস্কার বাঙালি জাতির সাংস্কৃতিক জীবনে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ে জানা যায় বঙ্গদেশে একসময় দ্রাবিড়দের আগমন ঘটে। পরবর্তীকালে আর্যজাতির আগমন প্রাচীন বাঙালি জাতির উৎপত্তির সহায়ক হয়েছে। ফলে এইসব জাতিগোষ্ঠীর ধর্ম ও সংস্কৃতি চিন্তার মধ্যে একসময় সংমিশ্রণ ঘটে।

বাঙালির আধ্যাত্মিক জীবন পৌরাণিক ধর্ম ও লৌকিক ধর্ম উভয়ের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। বাঙালি জাতির উৎপত্তির পর থেকেই বৃহত্তর ভারতীয় সংস্কৃতির অংশ হিসেবে আর্যসংস্কার ও অনার্যসংস্কার তার প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গ হয়ে গেছে। তবে অনার্য সংস্কার তখন ছিল নিজস্ব সংস্কার আর আর্যসংস্কার ছিল তার অর্জিত সংস্কার। তাছাড়া এই বঙ্গদেশে শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মের প্রচার ও প্রসার বিভিন্ন সময়ে হয়েছে। এক হিসেবে এই বঙ্গদেশ সর্বধর্ম সমন্বয়ের দেশ।

মানুষ ঈশ্বরের আরাধনা করার জন্য নিভৃত স্থানকে বেছে নেন। সেই কারণে এককালে নির্জন পার্বত্য প্রদেশে বা গুহাকে মানুষ ধর্মসাধনার জন্য গ্রহণ করেছিল। হিন্দু ধর্মের পূর্বপুরুষেরাও অর্থাৎ মুনি ঋষিরা নির্জন পার্বত্য অঞ্চলকে ধ্যান তপস্যার জন্য গ্রহণ করতেন। পরবর্তীকালে ঈশ্বরের উপাসনার জন্য মানুষ তৈরি করলেন মন্দির, মসজিদ, গির্জা প্রভৃতি। বঙ্গদেশে যখন যে বংশের শাসনাধীনে এসেছে তাদের নিজস্ব ধর্মমত অনুযায়ী সেই ধর্মের প্রচার ও প্রসারে সহায়তা করেছে। মধ্যযুগে মুসলমান শাসকের আবির্ভাব হওয়ায় প্রথম পর্বে কিছুকাল হিন্দুদের মন্দির উপাসনাস্থলের উপর একটা কোপ পড়ে। পরবর্তীতে উভয় ধর্মের মানুষের সোহার্দ্যমূলক সহাবস্থান অবশ্য চোখে পড়ে।

স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতের অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গের একটি প্রাচীন ঐতিহ্যমন্ডিত বর্ধিষ্ণু জনপদ হল চন্দ্রকোণা। চন্দ্রকোণার একটা প্রাচীন ইতিহাস রয়েছে। জনপদটি প্রাচীন মন্দির দেউলে পরিপূর্ণ। কোনো কোনো মন্দির সংস্কার করা হয়েছে তার প্রাচীন রূপ অবিকৃত রেখে। কিছু মন্দির আছে

যেগুলি ভগ্নপ্রায়। এখনও বহু মন্দিরে নিত্য পূজা-অর্চনা করা হয়। এগুলির সঙ্গে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ও সংস্কার জড়িয়ে রয়েছে। আমরা চন্দ্রকোণার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা মন্দির ও মন্দিরকেন্দ্রিক জীবনকে এই আলোচনায় ধরার চেষ্টা করব। প্রসঙ্গক্রমে তাদের লোকবিশ্বাস ধর্মবিশ্বাসের পরিচয়ও তুলে ধরার প্রচেষ্টা রয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

রামানুজ শ্রীসম্প্রদায়ের বড় অস্থল

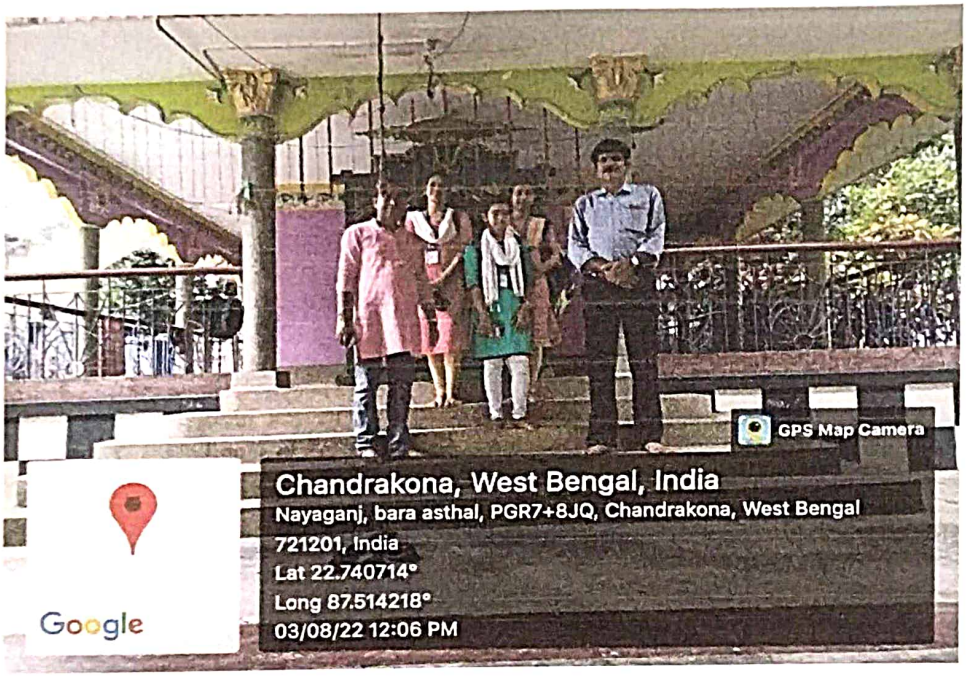

চন্দ্রকোণার পরিচিত রঘুনাথগড়ের কাছে নয়াগঞ্জ গ্রামে একটি অতি প্রাচীন 'অস্থল' প্রতিষ্ঠিত আছে। এটাই চন্দ্রকোণার সবচেয়ে বড় অস্থল। এই অস্থলের যাঁরা মোহান্ত তাঁদের গুরুপ্রণালী নিম্নে দেওয়া হল-

স্বরূপ রামানুজ বা স্বরূপানন্দ, জানকী, জয়রাম, হরিহর, গোপাল, লছমন, ভরত, বড় গোবিন্দ, রামচরণ, শ্রীরাম দাস, রামানুজ দাস মোহন্ত মহারাজ। স্বরূপ রামানুজ দাস মোহন্ত মহারাজ এখন থেকে প্রায় ৫০০ বছর আগে ভারতের দাক্ষিণাত্যের 'শ্রীরঙ্গম' নামক স্থানের মূলগাদি থেকে বঙ্গদেশে আসেন। বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারকল্পেই তাঁর বঙ্গদেশে আগমন। তিনি চন্দ্রকোণা পরগণার নির্জন স্থানে একটি আচারী মঠ স্থাপন

করেন।এ দেশে তাঁর আগমনের পূর্বে বৌদ্ধ, জৈন ও তান্ত্রিক উপাসনার প্রভাব বিদ্যমান ছিল। তৎকালীন চন্দ্রকোণার রাজা এই বৃদ্ধ ভূয়োদর্শী মানুষটিকে সমাদর করে নিজ রাজ্যে ঠাঁই দেন এবং তাঁর রাজ্যে রামানুজ শ্রীসম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ধর্ম ও মতবাদ প্রচারের জন্য একটি অস্থল প্রতিষ্ঠার অনুরোধ জানান।এ জন্য রাজা নব্বই বিঘা ভূ-সম্পত্তি দান করেন। বর্তমানে অস্থলটি এই ৯০ বিঘা জমির উপর দাঁড়িয়ে আছে। স্বরূপ রামানুজ বনাকীর্ণ অঞ্চল পরিষ্কার করে নয়াগঞ্জ নামে একটি নতুন গ্রামের পত্তন করেন। স্বরূপ রামানুজ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সুপন্ডিত সাধু ছিলেন। কথিত আছে রঘুনাথগড়ে রাজাবাহাদুর এক ভোজ সভার আয়োজন করেন। একসময় আকাশে ভীষণ মেঘ জমে। বৃষ্টি আসার উপক্রম হয়। তখন রাজাবাহাদুর অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি মোহন্তজীর শরণাপন্ন হন। সেই মোহন্তজী এক অলৌকিক ঘটনা সকলকে প্রত্যক্ষ করালেন। চতুর্দিকে মুষলধারে বৃষ্টি হয়ে গেলেও সেদিন রঘুনাথগড়ে একবিন্দুও বৃষ্টি হলো না। এই ধরণের জনশ্রুতি এখনো এই অঞ্চলের লোকসমাজে প্রচলিত আছে। এখানকার লোকায়ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই লোকবিশ্বাস আজও সমানরূপে বিদ্যমান।

গুরুপ্রণালী

'বড় অস্থল' নামক ধর্মীয় স্থানটিতে কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান নামের তিনটি প্রস্ত রয়েছে। এই তিনটি প্রস্তের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয় জীবনে কর্ম করলে তবেই মানবমনে ভক্তিভাবের উদয় হয়। আর ভক্তির মধ্য দিয়ে জ্ঞানের বিকাশ সাধন হয়। কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান জীবনে নিয়ে আসে পূর্ণতা। এই তিনটি বিষয় পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। কর্মে মতি থেকেই ভক্তির সঞ্চার হয় এবং ভক্তিভাবের মধ্য দিয়েই যথার্থ জ্ঞানের বিকাশ হয়।

বড় অস্থলের একটি সুবৃহৎ প্রবেশদ্বার রয়েছে। ভেতরে প্রবেশ করেই দেখা যায় শক্তপোক্ত প্রাচীর বেষ্টিত উন্মুক্ত স্থানে একটি বকুল গাছ আছে। এই বকুল গাছের নিচে একটি প্রশস্ত মণ্ডপের উপর মহাবীর শ্রী শ্রী গরুড়ের মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। বাইরের থেকে আসা তীর্থযাত্রীর দল এইখানে বিশ্রাম নিয়ে থাকেন। স্থানটি অত্যন্ত শান্ত, এখানে শান্তি বিরাজমান। এখান থেকে পূর্বদিকে অবস্থিত সুবিশাল গোশালাটিও দেখা যায়। পূর্বে এই গোশালায় একশোর উপর গরু থাকতো। ষাঁড় ও গাভী উভয় ছিল। এখন গোশালাটি ঐখানে আর নেই, তা অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়েছে। এই কর্মপ্রস্তের দক্ষিণ দিকে রয়েছে আরেকটি প্রবেশপথ। এর ভেতরে প্রবেশ করলেই একটি উন্মুক্তস্থল নজরে পড়ে। এর পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম দিকে বেশকিছু মনোরম বাড়ি চোখে পড়ে। এই সমস্ত বাড়িতে মোহন্ত মহারাজ, বহিরাগত অতিথি, সাধু-সন্ত ও ভক্তবৃন্দ বসবাস করেন। এই স্থানে আগে নাকি একটি মনোরম পুষ্প উদ্যান ছিল। যার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ একটি চাঁপা গাছ এখনো রয়ে গেছে। এই স্থানটিকেই বলা হয়ে থাকে ভক্তিপ্রস্ত। আগে ভক্তিপ্রস্ত ও জ্ঞানপ্রস্তের মধ্যে একটি প্রাচীর ছিল। বর্তমানে এই প্রাচীরটি নেই। বর্তমানে নতুন মন্দির নির্মাণের সময় সেই প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। পূর্বের প্রাচীরে দুটি দরজা ছিল। দরজা দুটির মধ্য দিয়েই জ্ঞানপ্রস্ত অর্থাৎ মূল মন্দিরে যাওয়া যেত। পূর্বের মূল মন্দির পূর্ব অভিমুখে এবং সম্মুখভাগে অবস্থিত ছিল। পশ্চিমদিকে শ্রী শ্রী মহাবীরের মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। বর্তমানে যিনি মোহন্ত মহারাজ এই স্থলে নতুন সুদৃশ্য মন্দির নির্মাণ করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন। নতুন মন্দির গুলির নির্মাণশৈলীতে দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের প্রভাব রয়েছে বলে অনুমিত হয়। শ্রী শ্রী মহাবীরের মন্দির নির্মাণের সময় এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল। শ্রী শ্রী গোপীনাথ ও শ্রী শ্রী রঘুনাথ জীউর মন্দির নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হলে মোহন্ত মহারাজ ভেবেছিলেন শ্রী শ্রী মহাবীরের মন্দির কিছু পরে তৈরি করবেন। উপরোক্ত মন্দির দুটি নির্মাণে প্রভূত অর্থ ব্যয় হয়, অর্থাভাব দেখা যায়। পরবর্তীকালে অর্থ সমাগম হলে এই মন্দিরের কাজে হাত লাগাবেন এইরকম একটা মনস্থির করেছিলেন। তাছাড়া প্রাচীন মহাবীরের পাশে একটি বিশালাকার মৌচাক থাকায় এর সম্প্রসারণও কষ্টদায়ক ছিল। কিন্তু একদিন গভীর রাতে লাল মহাবীর স্বপ্নাদেশ দিলেন মন্দির নির্মাণের জন্য। অর্থাভাব বা মৌচাক কোনটাই প্রতিবন্ধক হবে না মন্দির নির্মাণের পথে।

মোহন্তজী লক্ষ্য করলেন মৌচাক সেই স্থল থেকে উধাও হয়ে গেছে এবং বিভিন্ন দিক থেকে অর্থ সমাগমও হতে শুরু করেছে।ফলে তিনি মহাবীরের মন্দির নির্মাণে হস্তক্ষেপ করলেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই লাল মহাবীরের মন্দির নির্মিত হয়ে গেল।এই ঘটনা এখনও জনশ্রুতির আকারে এই অঞ্চলের লোকের মুখে মুখে ফেরে। ঈশ্বরের প্রতি অটল ভক্তি থেকে এই লোক বিশ্বাসের জন্ম।

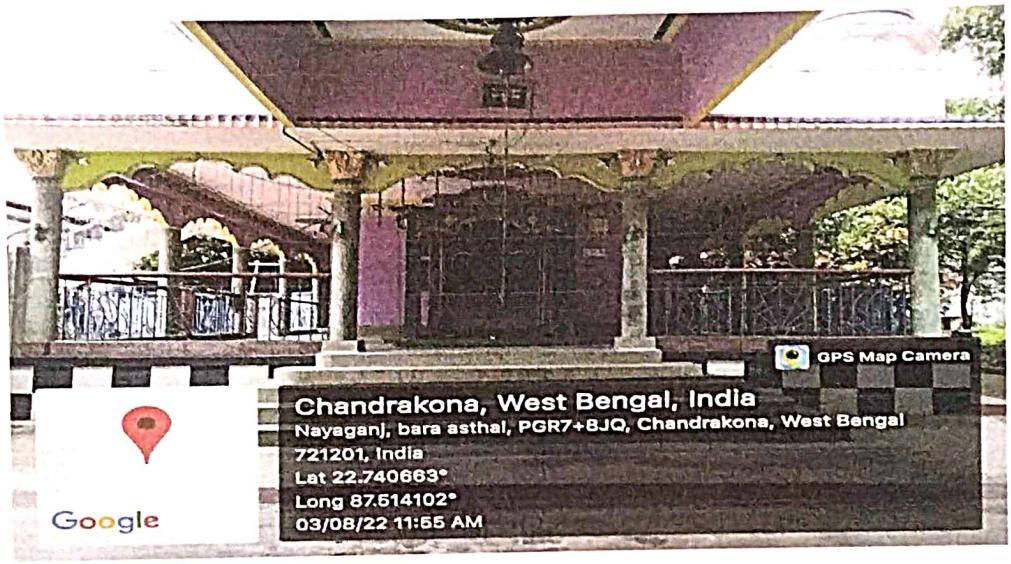

বড় অস্থলের মূল মন্দিরে শ্রী শ্রী রঘুনাথ, শ্রী শ্রী গোপীনাথ প্রভৃতি বহু বিগ্রহ ও বিষ্ণুশিলা অধিষ্ঠিত আছে।এখানে অনেকগুলি বিগ্রহ ও বিষ্ণুশিলা বর্তমান। এই বহু সংখ্যক বিগ্রহ ও বিষ্ণুশিলা থাকার কারণও রয়েছে। আসলে চন্দ্রকোণা ও তার চতুর্দিকে অবস্থিত অঞ্চলসমূহে প্লেগ, টাইফয়েড, কালাজ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা ও ম্যালেরিয়া প্রভৃতি মহামারীর প্রাদুর্ভাব ছিল। এর ফলে নির্বংশ ব্যক্তিরা তাদের দেবোত্তর সম্পত্তি ও বংশের প্রতিষ্ঠিত বাস্তু দেবতা এখানে দান করেছেন।

বিগ্রহ

বড় অস্থলের একটি জায়গায় মোহান্তদের ব্যবহৃত জুতো রক্ষিত হয়েছে।এগুলি হাতির দাঁত ও কাঠ দ্বারা নির্মিত। এগুলি আজও শোভা পাচ্ছে।আর একটি জায়গায় বিগত মোহন্তদের একটি বিছানা বা গদি আছে। মহারাজদিগের ব্যবহৃত জুতো বিছানাতে নিত্য পূজা-অর্চনা হয়। মূল মন্দিরের দক্ষিণ দিকে পঙ্গতখানা, অতিথিশালা ও ভোগশালা অবস্থিত এবং সম্মুখভাগে বিশাল নাটমন্দির ও কিছুদূরে পশ্চিম অভিমুখে মহাবীরের মন্দির নির্মিত হয়েছে।

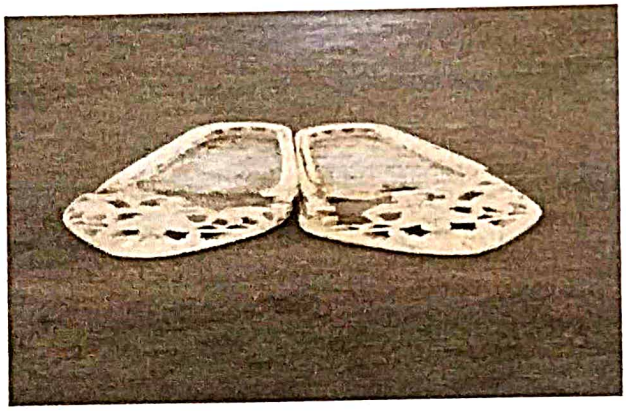

মোহান্তদের ব্যবহৃত জুতো

বড় অস্থলের গ্রন্থাগারে বিভিন্ন মোহন্ত মহারাজ ও সাধূগণের লেখা ও বহু পুরাতন পুঁথি সংরক্ষিত রয়েছে। মঠের বাইরের দিকে 'রামকুণ্ড' ও 'সীতাকুণ্ড' নামে দুটি পুকুর ও কৃষিক্ষেত্র আছে। 'রামকুণ্ড' পুষ্করিনীর

পূর্বপাড়ে মোহন্ত মহারাজদিগের সমাধি মন্দির প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। মোহন্তদের আবাসস্থলের পিছনদিকে 'লক্ষ্মীহামার' নামে একটি বড় ধানের গোলা ছিল। বর্তমানে এখানে একটি ফল ও পুষ্পের উদ্যান তৈরি হয়েছে।

চন্দ্রকোণার এই অস্থলের বেশকিছু শাখা অস্থল পূর্বে থেকেই আছে।তার মধ্যে একটি শাখা অস্থল হল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশপুর থানার অন্তর্গত শ্যামচাঁদপুর গ্রামে রয়েছে। এই অস্থল কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার একটা ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়। মোটামুটিভাবে যেটা জানা যায়, উক্ত গ্রামে নিত্যানন্দ সিংহ নামে একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন।তাঁর একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে তিনি শোককাতর হয়ে পড়েন। তখন তাঁর এক বন্ধু তাঁকে চন্দ্রকোণার বড় আখড়ার মঠাধীন লছমন মহারাজের শরণাপন্ন হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। লছমন মহারাজের কাছে গেলে তিনি নিত্যানন্দকে বলেন, 'কী নিত্যানন্দ, তোমার পুত্র মারা গেছে?' উত্তরে নিত্যানন্দ জানান, "হ্যাঁ মহারাজ।" নিত্যানন্দকে চিন্তামগ্ন দেখে মহারাজ বলেন, " চিন্তিত হইও না, এমন ছেলে তৈরি করো যে কখনো মরবে না।"

মহারাজের অভিপ্রায় উপলব্ধি করে নিত্যানন্দবাবু গ্রামে ফিরে এলেন। তারপর শ্যামচাঁদপুর গ্রামে একে একে শ্রী শ্রী রামচন্দ্র, সীতাদেবী ও লক্ষ্মণ জীউ প্রভৃতি অনেকগুলি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। এই দেবায়তনের পরিচালনার যাবতীয় দায়িত্ব তাঁর গুরুদেব লছমন মহারাজের হস্তে অর্পণ করেন। নিত্যানন্দবাবুর পত্নী প্রয়াত সূর্যমণি দেবীর প্রতিষ্ঠিত শ্যামচাঁদপুর গ্রামের শ্রী শ্রী রামচন্দ্র জীউর রথযাত্রা উৎসব অত্যন্ত জনপ্রিয়। শ্যামচাঁদপুর গ্রামে বর্তমানেও এই প্রাচীন অস্থলটি রক্ষিত আছে। কথিত আছে এই নিত্যানন্দ সিংহ নায়েক বিদ্রোহের সময় চন্দ্রকোণা শহর ও বগড়ী অঞ্চলের দারোগা ছিলেন। তিনিই চন্দ্রকোণা শহরের উত্তর দিকে অবস্থিত ফাঁসি ডাঙ্গায় যুগল ও কিশোর নামে দুই ডাকাতের ফাঁসি দিয়েছিলেন। এরা শ্যামদেব ও যুগলকিশোরের মাঠে রাহাজানি করত।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার সামাট গ্রামে বড় অস্থলের একটি শাখা অবস্থিত। এখানে এখনও মদনগোপাল জীউর বিগ্রহ বর্তমান। এছাড়াও শালবনী থানার অন্তর্গত যাত্রাবিষ্ণুপুরে যে অস্থলটি ছিল সেটিও বড় অস্থলের শাখা অস্থল। যাত্রাবিষ্ণুপুরে কানাইলাল জীউর বিগ্রহ অবস্থিত। চন্দ্রকোণা থানার অন্তর্গত ক্ষীরপাই ও হরিনারায়নপুরে এই বড় অস্থলের আরও দুটি শাখা অস্থল প্রতিষ্ঠিত ছিল। চন্দ্রকোণার মেজ অস্থল নামে আখড়াটিও বড় অস্থলেরই একটি শাখা। মেজো অস্থল প্রতিষ্ঠা করেন লছমন-মহারাজের একজন সুযোগ্য শিষ্য। তাঁর দামোদর দাস মোহান্ত। বর্তমানে এই মঠের শ্রী শ্রী রাধা বঙ্কুবিহারী ও শ্রী শ্রী রঘুনাথ জীউ বিগ্রহ বড় অস্থলের মন্দিরে বিরাজ করছেন।

বহু আগে থেকেই চন্দ্রকোণার এই মঠের জীউগণকে প্রতিদিন দই, গুড়, ছোলা ইত্যাদি নিবেদন করা হত। ক্ষীরপাই থেকে রাধানগর যাওয়ার পথে সরকারি পিচ রাস্তার পাশে বড়অস্থলের শ্রী শ্রী গোপীনাথ জীউর আদি মন্দিরটি অবস্থিত। এখানকার তন্তুবায় সম্প্রদায় এই দেবতার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তৎকালীন বড় অস্থলের সাধু গোপাল মহারাজকে ইনি স্বপ্নে এক বার্তা দেন। বার্তাটি হল " আমি আর এখানে থাকবো না, আমাকে তোমার অস্থলের গুড় ছোলা খেতে অত্যন্ত ইচ্ছে করছে; অতএব সত্ত্বর তুমি আমাকে ওখানে নিয়ে যাও।" একই সময়ে সেখানকার মন্দিরের পরিচারক তন্তুবায়দেরও স্বপ্নাদেশ দেন। জানান, " আমাকে তোমরা যদি চন্দ্রকোণার বড় অস্থলে না দিয়ে এসো তো তোমেদের বংশ থাকবে না।" এই জাতীয় স্বপ্নাদেশ পেয়ে গোপাল মহারাজ শ্রী শ্রী গোপীনাথ জীউকে নিয়ে আসার বন্দোবস্ত করেন।তিনি সেখানে পালকি পাঠিয়ে দেন। গোপাল মহারাজ সেখানে গিয়ে মহাসমাদরে মন্দিরের বিগ্রহগণকে পালকিতে তুলে নেন। তারপর চন্দ্রকোণা অভিমুখে যাত্রা করেন ১৭৩৩ শকাব্দে শ্রী শ্রী গোপীনাথ জীউ বড় অস্থলে আগমন ঘটেছে। এখনও শ্রী শ্রী গোপীনাথ জীউর রথযাত্রা উৎসব বিখ্যাত।

চন্দ্রকোণার বিখ্যাত বড় অস্থল নামে মঠ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল অঞ্চলের রামানুজ 'শ্রী' সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব মতবাদ প্রচার এবং দেব, অতিথি ও গো সেবা নির্বাহ করা। আগে বড় অস্থলের পরিচালনার জন্য বিভিন্ন রাজা-মহারাজা ও বর্ধিষ্ণু পরিবারের দান করা বহু মৌজায় বহু ভূ-সম্পত্তি ছিল। এখন সেই সব ভূ-সম্পত্তি আর নেই। বর্তমানে সরকারের দেওয়া অ্যানুইটির টাকা ও কিছু পরিমাণে খাস দখলী জমির থেকে আসা অর্থে বড় অস্থল ও এর শাখা অস্থলগুলির ক্রিয়া-কর্ম পরিচালিত হয়। জনশ্রুতি আছে পূর্বে এখানকার 'লক্ষ্মী হামার' ও অন্যান্য ধানগোলোয় এমন পরিমাণে খাদ্যশস্য মজুত থাকত যে মেদিনীপুর জেলায় দুই বছর দুর্ভিক্ষ হলেও খাদ্যশস্যের অভাব ঘটত না। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় এই খাদ্যভান্ডারের খাদ্যশস্য এই অঞ্চলের জনসাধারণের অনেকখানি উপকার করেছিল। বড় অস্থলের বিখ্যাত সাধু ভরত রামানুজ দাস মোহন্ত মহারাজ দীর্ঘকাল চন্দ্রকোণা পৌরসভার পৌরপিতা ছিলেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় চন্দ্রকোণার পৌর এলাকায় নানারকমের উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছিল। তিনি যে একজন দেশপ্রেমী ছিলেন তাই নয়, তিনি একজন সমাজসংস্কারকও ছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রামানন্দী শ্রীসম্প্রদায়ের ছোট অস্থল

চন্দ্রকোণা শহরের নরহরিপুর নামক গ্রামে আর একটি অস্থল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেটই সুবিখ্যাত 'ছোট অস্থল' নামে পরিচিত। অনধিক চারশ' বছর পূর্বে রাজস্থান থেকে একজন মোহান্ত মহারাজ চন্দ্রকোণায় এসেছিলেন। রাজস্থানের জয়পুর থেকে আগত মোহান্ত মহারাজের নাম হাবড়া দাস। তিনি চন্দ্রকোণায়

একটি লস্করী মঠ স্থাপন করেন। এই অস্থল স্থাপন সম্পর্কে প্রচলিত জনশ্রুতিটি এইরকম মোহান্ত মহারাজ হাবড়া দাস চন্দ্রকোণা শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে (বগড়ী) একটি জঙ্গলময় স্থানে একটি কুটির নির্মাণ করে সেখানে সাধনা শুরু করেন। এই সময় একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। চন্দ্রকোণা রাজবংশের এক রাজা (তিলকচাঁদ) মৃগয়ায় বের হয়ে পশুর পশ্চাদ্ধাবন করতে পথ হারিয়ে ফেলেন, কারণ তিনি সঙ্গীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। এমন সময় ঐ রাজা জঙ্গলের মধ্যে একটি ছোট্ট কুটির দেখতে পান। কুটিরে গিয়ে দেখেন দুইজন সাধু কুটির মধ্যে আছেন। রাজা বয়োজ্যেষ্ঠ সাধুকে নিজের সমস্যার কথা জানালেন। সাধুজী রাজা কে আশ্বস্ত করলেন এবং বললেন- 'আপনার লোকজন সকলেই এখুনি এখানে আসবেন, আপনারা আমার অতিথি সুতরাং সকলের জন্য আহার্য্য ও পানীয় দেওয়া হবে। এই কথা শোনামাত্র রাজা হেসে ফেলেন এবং বলেন তাঁর সঙ্গে তিনশত অনুচর আছেন। কাজেই তাঁরা একটি ছোটপাত্রে যে রান্না করেছেন তাতে সবার আহার্য্যের সঙ্কুলান হবে না। রাজা সাধুজীর কথায় বিশ্বাস রাখতে পারেননি। রাজার এই মনোভাব দেখে সাধুজী জানান, "পরমাত্মার ইচ্ছায় সকলই সম্ভব হয়।"

এতদসত্বেও রাজা আশ্বস্ত হতে পারলেন না। তিনি চিন্তামগ্ন হলেন। এরই মধ্যে রাজার অনুচরবর্গ সেখানে এসে হাজির হলেন। সাধুজী রাজার অনুচরবর্গকে স্বাগতম জানালেন এবং আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করলেন। সকলে উপবেশন করলে সাধুজী তাদের ভোজনের বন্দোবস্ত করতে শুরু করলেন। কুটিরস্থিত ক্ষুদ্র পাত্র থেকে তিনি অন্য পরিবেশন করতে লাগলেন। বনের গাছের পাতার অন্ন এবং পত্রপুটে জল পান করে সকলেই পরিতৃপ্ত হলেন। কিন্তু এই ঘটনা চাক্ষুষ করে রাজা বিস্মিত হয়ে গেলেন। তখনও তিনি সন্দিগ্ধ। তিনি ভেবেছিলেন কুটিরের মধ্যে নিশ্চয়ই বৃহৎ কোন পাত্রে খাদ্যবস্তু মজুত আছে। সেখান থেকেই পরিবেশিত হচ্ছে। এইরকম অনুমান থেকে রাজা সেই কুটিরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। প্রবশের অনুমতি পেলেন- কিন্তু কুটিরের মধ্যে প্রবেশ করে তিনি বিস্মিত হয়ে গেলেন। কুটিরের মধ্যে কেবলমাত্র একটি ক্ষুদ্র পাত্র ব্যতীত অন্য কোনো পা্ত্রে খাদ্যবস্তু নেই। এক্ষেত্রে একটি পৌরাণিক প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে। মহাভারত থেকে জানা যায়, কামাক বনে অবস্থানরতা দ্রৌপদী একটি মাত্র খাদ্যের পাত্রের সাহায্যে ৬০ হাজার শিষ্যসহ দুর্বাসা মুনির ভোজনের ব্যবস্থা করেছিলেন। খাদ্যের অভাব হয়নি সেদিন। রাজা দেখলেন সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। সাধুজীর মহিমা তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন। রাজা সাধুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। সাধুকে নিজ রাজ্যের রাজধানী চন্দ্রকোণা শহরে পদধূলি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। তখন সাধুজী রাজাকে জানালেন, "মহারাজ আপনি সেই সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের ইচ্ছায় আজ এখানে উপস্থিত হয়েছেন। প্রভুর ইচ্ছামতোই সমস্ত কার্য্য নির্বাহ হয়ে থাকে। আমি মহাত্মা রামানন্দ পন্থীগণের সম্প্রদায়ভুক্ত, রাজস্থানের গলতাগাদী (জয়পুরের নিকট) থেকে আসছি। উক্ত মহাপুরুষের ভাবধারা প্রচারের উদ্দেশ্যে আপনার রাজধানী শহরে একটি মঠ প্রতিষ্ঠার বিশেষ প্রয়োজন; এ বিষয়ে আপনি উদ্যোগী হলে পরমেশ্বরের কৃপা প্রাপ্ত হবেন।"

রাজা এতে আনন্দিত হয়ে সম্মতি প্রদান করলেন। উপরিউক্ত বন জঙ্গল সন্নিহিত গ্রাম যোগ্য ভূমি সহ ৮৫০ বিঘা (১৯১৬ সালের সেটলমেন্ট রেকর্ড অনুসারে ২৮৩ একর ৩৪ডেসিমেল) পরিমাণ ভূ-সম্পত্তি মঠ পরিচালনার জন্য দান করেন। বর্তমানে ঐ মৌজার নাম হয়েছে 'তিলকগঞ্জ', যা রাজার নামানুসারে রাখা হয়েছে। ১৯১৬ সালে তৎকালীন মোহান্ত শ্যামদাসের নামে রেকর্ড হয়েছে। বর্তমানে এই তিলকগঞ্জ মৌজা বগড়ি পরগণা ও গড়বেতা থানার অন্তর্গত।

চন্দ্রকোণা শহরের নরহরিপুর মহল্লায় প্রায় ১৮ বিঘা জমির উপর হাবড়া দাস মোহান্ত মহারাজ উক্ত মঠটি স্থাপনের কাজে অগ্রণী ভূমিকা নেন। এই অঙ্গনটিতে কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান নামে তিনটি প্রস্ত আছে। প্রথম প্রস্তটি চারিদিকে এদিকে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। দ্বিতীয় প্রস্তে সুদৃশ্য অট্টালিকা বেষ্টিত ফুলের বাগান, অতিথিশালা,ধুনি ও কাচারীবাটী আছে। তৃতীয় প্রস্তে ভগবান লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর পূর্বদিকে অবস্থিত শ্রীমন্দির।এছাড়াও এখানে ঝুলন মন্দির, নাটমন্দির, দালানবাটী, একটি সুবৃহত তুলসীমঞ্চ, পঙ্গতখানা, ভান্ডারশালা ও কূপ ইত্যাদি অবস্থিত আছে। মঠের বাইরের দিকে বাঁধানো ঘাটযুক্ত কোঠা ও ঠাকুর নামক দুটি পুকুর ও কৃষিক্ষেত্র রয়েছে।

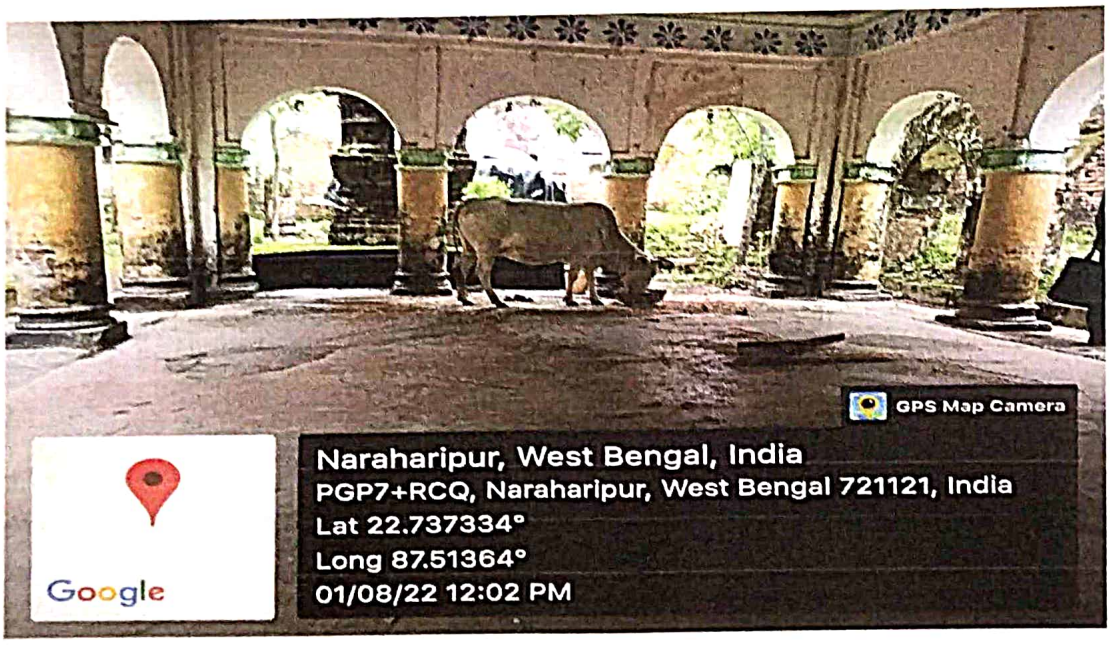

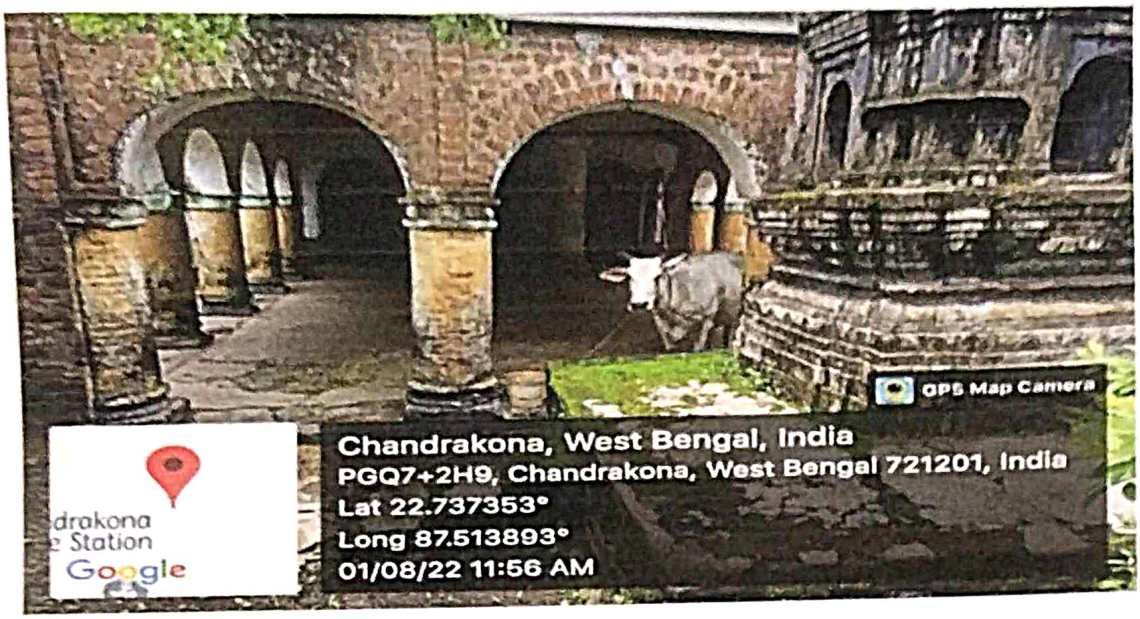

মূল মন্দিরে লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর দুইপাশে লক্ষ্মী, সরস্বতী, রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, রুক্মিণী, কৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি বহু বিগ্রহ ও বিষ্ণুশিলা বিরাজিত আছেন। এর মধ্যে একটি স্ফটিকের মতো উজ্জ্বল, স্বচ্ছ গোলাকার ভাস্কর শিলা সূর্য মন্ত্রে পূজিত হন। জানা গেছে হাবড়া দাস মোহান্ত মহারাজ একটি লক্ষ্মী জনার্দন জীউ শ্রীবিষ্ণু শিলা সঙ্গে নিয়ে আসেন। মঠে প্রথমে সেই শিলাটিই প্রতিষ্ঠা করা হয়। এইজন্য নির্মিত হয় একটি মন্দির। মন্দিরটি আংশিক ভগ্নাবস্থায় এখনো মঠে দেখা যায়। বেশ কিছু পুরনো পুঁথি মোহান্তগণ যত্ন করে রেখে গেছেন।

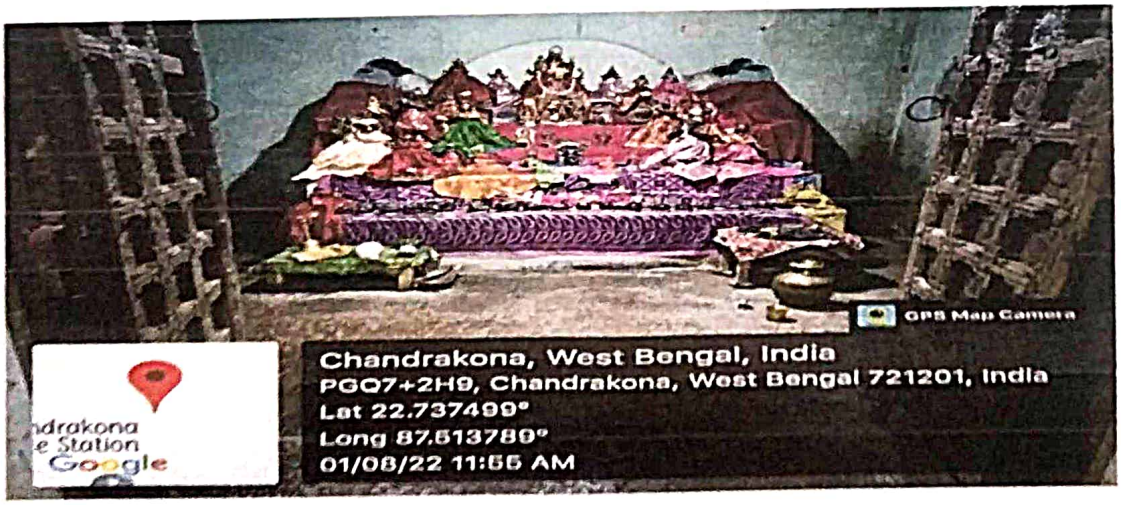

বিগ্রহ

পুঁথি

মন্দিরগাত্রে দেবীমূর্তি

হাবড়া দাসের পর মোহান্ত হন তুলসীরাম দাস। তিনিই ছিলেন দ্বিতীয় মোহান্ত। এরপর যাঁরা মোহান্ত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তাঁদের নাম বা পরিচয় সঠিকভাবেই পাওয়া যায় না । এরমধ্যে রামরঙ্গী নামে এক মোহান্তের কথা জানতে পারা যায়। রঘুনাথ বাড়ির কাছে অযোধ্যা মৌজায় 'রামরঙ্গী পুষ্করিণী' নামক জলাশয়টি তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে রঘুবর দাস নামে একজন সাধক মোহান্ত হন। ইনি মোহান্ত হয়ে উক্ত মঠের আরও উন্নতিসাধন করেন। এছাড়া তাঁর সময়েই শ্রী শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ ছোট অস্থলে আগমন করেন। এই লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর ছোট অস্থলে আগমন সম্পর্কে একটি কাহিনি লোকসমাজে প্রচলিত আছে। শোনা যায়, এক বণিক তাঁর জাহাজের নোঙর তোলবার সময় দেখেন নোঙরের সঙ্গে একটি শঙ্খ-চক্র-গদা- পদ্মধারী চতুর্ভুজ মূর্তি যাঁর দুইপাশে লক্ষ্মী ও সরস্বতী বিরাজ করছেন। তা জল থেকে উপরে উঠে আসছে। এই চতুর্ভুজ মূর্তিটি অষ্টধাতুর সমন্বয়ে নির্মিত এবং এতে গুপ্ত শাসনকালের শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় স্পষ্ট। মূর্তিটি কোনো কারণে জলে ফেলা হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। যাইহোক সওদাগর অতি সযত্নে মূর্তিটিকে নিজের কাছে রাখেন। পরে তিনি স্বপ্নাদেশ পেয়ে মূর্তিটিকে ছোট অস্থলের রঘুবর দাস মোহান্তের কাছে নিয়ে আসেন। তবে মোহান্ত রঘুবর দাস বণিককে জানিয়ে দেন যে, ইনি স্বপ্নাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত পূজা করবেন না। কাজেই মোহান্ত মূর্তিটিকে তাঁর লক্ষ্মীহামারে ধানের সঙ্গে স্থাপন করে রাখেন। এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর একদিন লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ মোহান্ত রঘুবর দাসকে স্বপ্নাদেশ দিলেন- "আমি লক্ষ্মীনারায়নণ বিগ্রহ, তুমি আমার প্রতিষ্ঠা কর- তোমার পূজা পাবার জন্য আমি এখানে এসেছি ও এখানেই থাকব।" এই স্বপ্নাদেশ পাওয়ার

পর মহাসমারোহে বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হয়। তারপর থেকেই এই বিগ্রহ সকলের কাছেই পূজিত হয়ে আসছেন।

লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ পার্শ্ব একাদশীর দিন শোভাযাত্রা সহকারে চন্দ্রকোণা নগর পরিক্রমা করতেন। নগর পরিক্রমাশেষে পূর্বে উল্লেখিত 'রামরঙ্গী' পুষ্করিণীতে জলক্রীড়া করতেন। জমিদারী প্রথা বিলোপের ফলে অস্থলের আয় অনেকটাই কমে যায়। তাই এই উৎসব বন্ধ হয়ে গেছে। পূর্বে সুদৃশ্য বস্ত্রালংকারে সজ্জিত করে বিগ্রহটি চতুর্দ্দোলায় বসিয়ে বিশাল রূপার দন্ডযুক্ত ছাতা, আসা,সোটা, আড়ারী, বল্লম ইত্যাদি বাহিত বাদ্য-ভান্ডসহ এই শোভাযাত্রা যথেষ্ট আকর্ষণীয় ও দর্শনীয় ছিল। লোকসমাজের প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর সঙ্গে স্থানীয় অযোধ্যাধামের ভগবান রঘুনাথ জীউর বন্ধুত্ব আছে। এইজন্য পার্শ্ব একাদশী তিথিতে লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ 'রামরঙ্গী' পুষ্করিণীতে জলক্রীড়া শেষে নিজের মন্দিরে প্রত্যাগমণের পথে রঘুনাথ জীউর মন্দিরে প্রবেশ করতেন। এরপর তাঁর সঙ্গে লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর সঙ্গে এর সখ্যভাবে ফুলের মালা আদান-প্রদান ও প্রসাদন্দম হতো এবং রাজার পক্ষ থেকে প্রণামী করা হতো। আবার বিজয়া দশমীর রথোৎসবের দিন ছোট অস্থলের মোহান্তকে রাজার ঠাকুর রঘুনাথ জীউকে প্রণামী করতে হতো। অপরদিকে রাজার তরফ থেকে মোহান্ত মহারাজ মালা ও শিরোপা পেতেন।

দোলযাত্রার আগের দিন চাঁচর উপলক্ষে ছোট অস্থলের বিগ্রহ সমূহকে চাঁচরবেড় নামক স্থানে 'চাঁচর উৎসব' সম্পন্ন করার জন্য নিয়ে যাওয়া হতো। এই উপলক্ষে বিগ্রহ সমূহকে চতুর্দ্দোলায় বসিয়ে বাদ্য-ভাণ্ড সহযোগে হাতিঘোড়া সহ বিশাল শোভাযাত্রা বাজি পোড়াতে পোড়াতে চন্দ্রকোণা শহরের পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত চাঁচরবেড় জায়গায় নিয়া যাওয়া হতো। চাঁচর উৎসব সম্পর্কে এই লোক-কাহিনিটি প্রচলিত যে, গোবিন্দপুর মহল্লায় যেটি নিবেদিতা ভবন হয়েছে ঐ বড়িটি নাকি কল্প ময়রা নামে ধনী মোদকের ছিল। শোনা যায়, ঐ চাঁচর শোভাযাত্রার অগ্রভাগে হাতি থাকত এবং মাহুত হাতিকে সঙ্কেত করে ঐ মোদকের দোকান থেকে মিষ্টান্ন ছড়িয়ে দিত। আর উচ্ছৃঙ্খল জনতা সেখান লুণ্ঠন চালাত। পরে এক বছর ঐ মোদক শোভাযাত্রা আসবার আগে থেকে গুড় ফুটাতে থাকে এবং লুণ্ঠনকালে হাতির চোখে ও লোকজনেদের গায়ে ফুটন্ত গুড় ছিটিয়ে দেয়। ফলে শোভাযাত্রায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় এবং তারপর থেকে চাঁচর উৎসব বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু চন্দ্রকোণার পশ্চিম প্রান্তে ঐ জায়গার নাম এখনো রয়ে গেছে।

এই সুপ্রাচীন মঠে জীউগণের নিত্য অন্নভোগ ছাড়াও সারা বছর নানারকম পালা-পার্বণ অনুষ্ঠিত হয়। এখানকার প্রধান উৎসব হল ঝুলন। এই সময় পাঁচ রাত্রি ধরে কীর্ত্তন, রামায়ণ ও যাত্রাগান ইত্যাদি হয়ে থাকে। শ্রীরানবমী, দোলযাত্রা, পুষাভিষেক ইত্যাদি পর্ব্বও এখানে পালিত হয়। রঘুবর দাসের

পর শ্যামদাস, পরে সিয়ারাম দাস, মঙ্গল দাস, শ্রীমধুসূদন দাস মোহান্ত হন। চন্দ্রকোণার এই ছোট অস্থল নামে লস্করী মঠটির উদ্দেশ্য এই অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মপ্রচার, দেব, অতিথি ও গো-সেবা নির্বাহ করা। এই মঠের শাখা মঠ রুপে মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমায় রাণীর বাজার, খড়ার শহরের নিকট দন্দীপুর ও হাওড়া জেলার অন্তর্গত গহলাবন্দ নামক স্থান আছে। রাণীরবাজার মঠে শ্যামরায় জীউ, দন্দীপুর মঠে রঘুনাথ জীউ ও হাওড়া জেলায় গহলাবন্দ মঠে সীতারাম জীউ বিরাজিত আছেন।

অতীতে তীলক মহারাজের দান তিলকগঞ্জ মৌজা ব্যতীত পাঁচঘড়া, রতনপুর, সোনারবেড়, লাওড়াশোল, তেলেগোড়া, বলদঘাটা, গুয়াফেলা, মালবাঁন্দি, কমরখণ্ড, ইত্যাদি বহু মৌজায় বহু ভূ-সম্পত্তি চন্দ্রকোণা শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার ধর্মপ্রাণ দানশীল ব্যক্তিগণের দানে অস্থলের অধিকারে ছিল। বর্তমানে মঠের চতুস্পার্শ্বস্থ কিছু পরিমাণ ধানের জমি ও মাধবপুর, অযোধ্যা মৌজায় এবং চন্দ্রকোণা শরের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত সীতানগর ও ভগবানবাটী মৌজায় কিছু কিছু ধান জমির উৎপন্ন শস্যে দেব সেবা, অতিথি সেব এবং কিছু দুঃস্থ ব্যক্তিকে প্রত্যহ অন্নদান ইত্যাদি কোনরূপে নির্বাহ হয়।

প্রাচীন বর্ধিষ্ণু জনপদ চন্দ্রকোণা ধর্মীয় ও লোকবিশ্বাস- লোকসংস্কারগত ঐতিহ্য ও পরম্পরা আজও সমানে বহন করে চলেছে। আমাদের পূর্বোক্ত বিষয়ভিত্তিক আলোচনা ও বিশ্লেষণে তার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত তথা রূপরেখা তুলে ধরার প্রয়াস রয়েছে। এই অঞ্চলের প্রাচীন মন্দির দেউলের সংখ্যাও প্রচুর। এর মধ্যে বেশ কিছু মন্দির স্থানীয় মানুষজন বা স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগে সংস্কার করা হয়েছে। এইসব মন্দিরগুলোতে আজও পূজা-অর্চনা যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে করা হয়। শুধু তাই নয়, মন্দিরগুলোর সঙ্গে স্থানীয় লোক-মানসের বিশ্বাস সংস্কার জড়িয়ে রয়েছে। মানুষের ধর্মচেতনার নিগূঢ় পরিচয়ও আমরা পাই এখান থেকে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অসম্ভব উন্নতির যুগে দাঁড়িয়েও এখানকার মানুষ কিন্তু ঐতিহ্য বিচ্যুত হয়নি। বরং বলা চলে তারা বাস্তব জীবনে বিজ্ঞানকে আঁকড়ে ধরেও পরম্পরাকে বহন করে চলেছে। আর এ থেকেই বোঝা যায় ভারতীয় ধর্মসাধনা ও বিশ্বাসের শিকড় কতটা গভীরে প্রোথিত। বঙ্গদেশের একটি ছোট জনপদ চন্দ্রকোণা –এর সাথে ভারতীয় ধর্মসাধনার যেমন নিগূঢ় যোগ রয়েছে তেমনি তার ধর্ম বিশ্বাস সংস্কারগত কিছু মৌলিক বিশিষ্টতাও রয়েছে। ফলে মন্দির দেউল অধ্যুষিত প্রাচীন এই জনপদটি এখনও তার পরিচয় অটুট রেখেছে।